কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ৫৭ নম্বর বই—

তেরো নম্বর বাড়ী

শ্রীস্বপনকুমার

উপহার

তেরো নম্বর বাড়ী

এক

—মাঝরাতের অতিথি—

শহরের কুখ্যাত অঞ্চল চোরবাগান।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে রমেশ দত্ত স্ট্রীট ধরে এগিয়ে গেলে পড়া যায় বিডন স্কোয়ারে। আর বিডন স্কোয়ার অর্থাৎ 'কোম্পানির বাগান' শহরের যতো কিছু অন্যায়, দুর্নীতি আর ক্রাইমের গোপন আড্ডা।

কোম্পানির বাগানের কুখ্যাতির অবশ্য কারণ আছে। এর একদিকে রামবাগান নামে খ্যাত পতিতা নারীদের আবাসস্থল সার সার সব বাড়ি, অন্যদিকে সোনাগাছি। শহরের সবচাইতে বড় পতিতা-কেন্দ্র।

পুলিসের বড় বড় অফিসার আর সি. আই. ডি.দের দৃষ্টি তাই কোনও সময়েই এই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও নিবদ্ধ হয় না—যখনই কোনও বড় ক্রাইমের সংবাদ পুলিস বিভাগকে বিচলিত করে।

কিন্তু ক্রিমিন্যালদের মনোবিজ্ঞানের একটা বিশেষ দিক আছে।

পুলিসের লোকেদের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও কোম্পানির বাগানকে ঘিরে নানা ধরনের চক্রান্তের জাল ফেনিয়ে ওঠে। দিনের পর দিন ক্রাইম ওয়ার্লডের কুখ্যাত ক্রিমিন্যালেরা এই অঞ্চলে তাদের অন্যায় ব্যবসা চালিয়ে যায় অপ্রতিহত গতিতে।

সেদিন সন্ধ্যা ছটা।

তেরো নম্বর বাড়ী

কোম্পানির বাগানের সামনে বিডন ষ্ট্রীটের আগের স্টপেজে ট্রাম থেকে নামল একজন লোক। পরনে অল্পদামী স্যুট। চোখে চোয়ালে দৃঢ়তা আর বুদ্ধির প্রাখর্যের পরিচয়।

ট্রাম রাস্তা থেকে পূব দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা ধরে লোকটা দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, সে যেন কিছুটা চিন্তিত। তবে কি কারণে তার এই অহেতুক চিন্তা তা সহজে বোঝা যায় না।

গলির মোড়ে ছোট পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে সে এক প্যাকেট সিগারেট চাইল।

পানওয়ালা বলল—বাবু, 'মেপোল' সিগ্রেট এখানে পাওয়া যায় না, আপনি কাঁচি এক প্যাকেট নিন।

—বেশ তাই দাও। লোকটা পাঁচ আনা পয়সা পকেট থেকে বের করে ছুড়ে দিল দোকানীর দিকে। তারপর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা বের করে দু ঠোঁটের ফাঁকে লাগিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করল একটা জ্বলন্ত দড়ির আগার জলন্ত আগুন থেকে।

একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে লোকটা এগিয়ে চলল হন্ হন্ করে।

রাস্তাটার নাম যদিও লেন নয়, তবু সেটাকে গলি বললে মোটেই ভুল বলা হয় না।

পাশাপাশি দোতলা, তিনতলা, একতলা ইত্যাদি হরেক রকম আকৃতির বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই দু চারজন নানালংকারভূষিতা নারী দণ্ডায়মান। তাদের দেখে আর যা কিছু মনে হোক না কেন, তারা যে সাধারণ ভদ্র নারী নয় তা যে কেউ খুব সহজেই বুঝতে পারে তাদের ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তা থেকে।

দু একটি মেয়ে ঠোঁটে জলন্ত সিগারেট নিয়ে এমন অনায়াস ভঙ্গীতে টানছে

যে মনে হয় এ কাজে তারা যথেষ্ট অভ্যস্ত। তবে তারা অধিকাংশই সিগারেট খাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে মাত্র—এ কাজে তারা খুব বেশি পটু নয়।

একটি বাড়ির সামনে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সামনে-দাঁড়িয়ে-থাকা একটি মেয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—অনিল এ বাড়িতে থাকে?

খিল খিল করে মেয়েটা হেসে উঠল। তারপর বলল—মশাই কি এ পাড়ায় নতুন পা দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কেন বলুন ত?

—কারণ এখানে অনিল, অমিত, অজিত এমন নামের কাউকে পাবেন না, বরং অনিলা, অমিতা, অজিতা ইত্যাদি নাম ধরে খুঁজলে কাউকে পেতে পারেন।

—বুঝেছি। তাহলে হয়ত ভুল করেছি—কিন্তু…

পাশের একটি মেয়ের কানে কথাগুলো গিয়েছিল। সে বলল—দাঁড়ান একটু। আপনি কোন্ অনিলের খোঁজ করছেন? তার পুরো নাম কি?

—অনিল সামন্ত।

—একবার জাল নোট চালাতে গিয়ে যার এক বছর জেল হয়েছিল, সেই কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি ঠিক ঠিকানাতেই এসেছেন। অনিল সামন্ত হচ্ছে আমাদের কমলার বাবু।

—কমলা?

—হ্যাঁ। সোজা তিনতলায় চলে যান। দুখানা ঘর পেরিয়ে ডানদিকের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেবেন।

—কিন্তু…

লোকটি ইতস্ততঃ করতে থাকে। মেয়েটি তাকে সাহস দিয়ে বলে—ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি না পুরুষ মানুষ!

…দরজা খুলে দেয় একটি নারী। (পৃষ্ঠা ৯)

—না, ভয় কিসের! লোকটা সোজা উপরে উঠে যায়। ছখানা ঘর পেরিয়ে একটা দরজায় ঘা দেয়। পর পর টোকা মারে তিন চার বার।

—কে? ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়।

—দরজাটা খুলুন একটু।

—দাঁড়ান।

আধ মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে দেয় একটি নারী।

—আপনি?

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমার নাম অনিলের কাছে বললেই সে চিনতে পারবে আমাকে। তাকে বলবেন যে জেলখানায় তার কামাখ্যাপ্রসাদ নামে যে লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সে দেখা করতে এসেছে।

—আপনি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, একটু দাঁড়ান।

একটু পরেই আবার দরজা খুলে যায়।

একজন লোককে দেখা যায় দ্বারপ্রান্তে।

—তুমি? কামাখ্যাপ্রসাদ প্রশ্ন করে।

—কেন, আমাকে চিনতে পারছ না?

—না।

—আমিই ত অনিল সামন্ত।

—কিন্তু…

—ও, তুমি ঘাবড়ে গেছ বন্ধু! অবশ্য আমার চেহারা আগের চেয়ে অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে।

—ও, তাহলে তোমার সঙ্গে এখন বেশি কথা বলার সময় নেই! পরে একদিন সময়মত······

—না না, তুমি এখানেই বসো না কেন···

—না ভাই। এসবে কোনও রুচি নেই আমার। আমার ঠিকানাটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি···

কথা শেষ হয় না।

পেছন থেকে শোনা যায় রিভলভারের গর্জন। একটা আর্ত চীৎকার, কামাখ্যাপ্রসাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দুই

—হত্যার পর—

এক মিনিটের মধ্যে যেন সারা বাড়ি জুড়ে হুলুস্থুল শুরু হয়ে যায়।

দলে দলে লোক ছুটে আসে ওপরে। মৃতদেহ ঘিরে একটা ছোটখাট জনতার সৃষ্টি হয়।

কোম্পানির বাগান এরিয়াতে ছোটখাট ব্যাপার উপলক্ষেই হৈ চৈ করবার লোকের অভাব নেই। আর এ ত কোনও ছোটখাট ব্যাপার নয়, এ হচ্ছে রীতিমত একটা নরহত্যা!

দেখতে দেখতে সারা অঞ্চলটাতে রটে যায় একটি কথা। নরহত্যার সংবাদে সকলে বিচলিত হয়ে পড়ে।

কামাখ্যাপ্রসাদের বন্ধু অনিল সামন্ত এরকম একটা ঘটনার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পুলিশ এলে যে তাকেও ক্ষমা করবে না, তা সে বুঝতে

পেরেছিল। কোল্‌কাতা শহরে পুলিসবাহিনী কখনও নীরবে কোনও কাজ করে না। সমস্ত পাড়া সরগরম করে কাজ করতেই ভালবাসে তারা। তাই হয়ত বাড়িসুদ্ধ লোককেই গ্রেপ্তার করে বসবে!

কমলা নামে যে মেয়েটার ঘরে অনিল সামন্ত থাকে, সে বলল পুলিসে ফোন করতে।

অনিল সামন্ত বুঝতে পারল, পুলিসে ফোন না করে যদি পালাবার চেষ্টা করা যায় তাতে বিপদ আরও বেশি। তাই জোড়াবাগান থানার উদ্দেশে ছুটল ঘটনাটা জানাবার জন্যে। ফোন করার চেয়ে থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করা অনেক বেশি নিরাপদ। তিনি তাকে সামনাসামনি দেখলে হয়ত বিশ্বাস করবেন যে সে অপরাধী নয়।

অনিল সামন্ত কমলাকে সেই কথা বলে রওনা হলো জোড়াবাগান থানার উদ্দেশে।

কমলার অবস্থা দাঁড়াল অনেকটা জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যে অবস্থা হয়, ঠিক সেইমত।

একপাল অসামাজিক মেয়ে আর একগাদা পাড়ার গুণ্ডা, রকবাজ শ্রেণীর লোক তার ঘরকে ঘিরে নানা প্রশ্নে তাকে বিব্রত করে তুলল। কিন্তু একটা প্রশ্নের সমাধান করতে পারল না কেউ। যে লোকটা কামাখ্যাপ্রসাদকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে পলায়ন করল কোন্ পথে?

• • •

জোড়াবাগান থানার ও. সি. বিজলীমোহন দত্ত। চল্‌তি কথায় ক্রিমিন্যালরা তাঁকে ডাকে 'বিজলীবাতি' বলে। সত্যিই লোকটার ক্ষমতা আছে। তা না হলে এই রকম একটা কুখ্যাত অঞ্চলকে তিনি শাসনে রাখেন কেমন করে?

বিজলীবাতি শুধু ঝলকই দেয় না, তাকে ছুঁলে 'শক' লাগে হাতে। ঠিক তেমনি বিজলীবাবুর ধাক্কা যে একবার খেয়েছে সে জানে লোকটার সঙ্গে অনর্থক ঝামেলা করতে গেলে তিনি কাউকেই রেহাই দেন না।

হঠাৎ ঠিক সন্ধ্যার সময় অনিল সামন্তের মত লোককে থানায় পদার্পণ করতে দেখে বিজলীবাবু একটু অবাক হলেন।

তা ছাড়া অনিল সামন্তের ভাবভঙ্গীও স্বাভাবিক নয়। মুখে-চোখে একটা ভয়ের চিহ্ন। কেমন যেন আতঙ্ক আর বিভ্রান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

—কি খবর হে? হঠাৎ তোমার আগমন?

—বিনা কারণে নয়।

—তা ত বুঝলাম। কিন্তু কেন?

—বিপদে পড়েই আসতে হয়েছে স্যর!

—কি ধরনের বিপদ বলো ত?

—একটা খুন!

—খুন?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—কমলার ঘরে।

—সে কি কথা? কে খুন হলো?

—আমার বহুদিনের চেনা একজন দাগী আসামী। দুবার ৪২০ ধারার আর একবার রাহাজানির জন্যে জেল খেটেছিল লোকটা। জেলেই আমার সঙ্গে পরিচয়।

—নাম কি?

—কামাখ্যাপ্রসাদ।

—আচ্ছা। ক্রিমিন্যাল রেকর্ডটা দেখব আমি। কিন্তু তাকে হঠাৎ খুন করলে কে ?

—বললে বিশ্বাস করবেন না স্যর, একটা ছায়া যেন হঠাৎ তাকে খুন করল।

—তার মানে ?

—সে আমার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা করতে এসেছিল। এসব খারাপ পাড়ায় যাতায়াত অবশ্য অভ্যেস ছিল না লোকটার। তাই বেশ একটু অবাক হয়েছিল। তবে কি একটা কথা বলবার জন্যেই যে সে এসেছিল তা বুঝেছিলাম।

—তারপর ?

—হঠাৎ দেখলাম সিঁড়ির মুখে একটা ছায়া। পিস্তলের গর্জন। কামাখ্যার চিৎকার। লোকটা খুন করে কোথায় যে হঠাৎ না-পাত্তা হলো বুঝতেও পারলাম না!

—বুঝেছি। কিন্তু···

—আর একটা কথা স্যর···

—বলো।

—আমার মনে হয়, কামাখ্যার পেছনে লোক লেগেছিল।

—কোথাকার লোক ?

—বোধ হয় কোনও দলের···

—আচ্ছা, দেখছি। চলো তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখি আগে। তারপর যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।

তিন

—তদন্তের পর—

কমলার বাড়িতেও আসল ব্যাপারটার কোনও হদিস মিলল না। মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠান হলো।

বিজলীবাবু বুঝলেন মৃতদেহের ঠিক পেছন থেকে কোনও লোক ২৮ বোরের পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে। পিস্তল নিশ্চয়ই লোডেড ছিল। কিন্তু এ মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এ বাড়িতে যে কটা মেয়ে থাকত সকলকেই তিনি জেরা করলেন।

সকলেই বলল, কালো জাম্পার আর প্যান্ট পরা একজন লোককে তারা পালাতে দেখেছে। কিন্তু সে যে আসলে কে, সে হদিস মিলল না শত চেষ্টাতেও।

কাজকর্ম শেষ করে বিজলীবাবু থানায় ফিরে এলেন। এরকম একটা মিস্টিরিয়াস মার্ডার তিনি জীবনে খুব বেশি দেখেননি। তাই বিগত ঘটনাগুলোর চিন্তা তাঁর মনকে আলোড়িত করে তুলল।

* * *

রাত সাড়ে নটা কি দশটা।

বিজলীবাবু থানা থেকে বাড়ি ফিরবেন ঠিক করেছেন। কাল এই নতুন কেসটা নিয়ে ভাবা যাবে।

হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ তাঁর চিন্তাপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করল। তিনি রিসিভার তুলে প্রশ্ন করলেন—হ্যালো, কে?

—আমি। আমাকে চিনবেন না আপনি বিজলীবাবু। তার হয়ত নাম শুনেছেন।

বিজলীবাবু বুঝলেন লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলা বলছে। লোকটা বাংলায় কথা বললেও সে যে বাঙালী নয়, তা বুঝতে বিজলীবাবুর কষ্ট হলো না।

—কি নাম তোমার? বিজলীবাবু প্রশ্ন করেন।

—গ্রীন ড্রাগনের নাম শুনেছেন? আমি তার অনুচর মীরজা হোসেন।

—তোমাদের 'গ্রীন ড্রাগন' কি অদ্ভুত জীব জানি না, তবে এটা সত্যি যে ওসব অদ্ভুত নাম শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না তোমার।

—তা জানি। কিন্তু বিজলীবাবু, একটা জরুরী কথা জানাতেই হবে আপনাকে। তাই টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ করছি।

—কি জরুরী কথা?

—চোরবাগানের খুনটার ব্যাপারে।

—তাতে তোমার কি স্বার্থ?

—স্বার্থ আমার নয়—স্বার্থ গ্রীন ড্রাগনের।

—বেশ, তা না হয় মানলাম। কিন্তু গ্রীন ড্রাগন তোমাকে কেন ফোন করতে বলছে?

গ্রীন ড্রাগন জানে আসল খুনী কে! তাই সে চায় যে আসল খুনী ধরা পড়ুক।

—তা বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা। গ্রীন ড্রাগনের কথা যে সত্যি তার প্রমাণ?

—বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। তবে এ কথা ঠিক যে বিনা কারণে কাউকে মিথ্যা কথা বলবার মতো মনের ইচ্ছা বা দুর্বলতা আমাদের আদৌ নেই!

—বেশ, এসব কথা শুনলাম। এবার বল ত আসল অপরাধী কে?

—আসল অপরাধীর নাম শুনলে আপনি হয়ত চিনতে পারবেন। বিখ্যাত চীনা দস্যু হোয়াংলীর নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—হোয়াংলী কিন্তু আসলে চীনেম্যান নয়। ওর মা চীনেম্যান আর বাবা ইউরোপীয়ান। হোয়াংলীকে তাই ঠিক চীনেম্যান বলে মনে হয় না। ইচ্ছামত যে কোন পোশাক পরতে ও পারে।

—বুঝেছি। কিন্তু হোয়াংলীর সঙ্গে এ হত্যাকাণ্ডের কি সম্বন্ধ ?

—হোয়াংলীর লোকই খুন করেছে কামাখ্যাপ্রসাদকে। হোয়াংলীর দলে আছে অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, অ্যামেরিকান, ভারতীয়, বার্মিজ ইত্যাদি লোক।

—তাদের মধ্যে কে হত্যা করেছে কামাখ্যাপ্রসাদকে ?

—তা ঠিক জানি না আমরা।

—হোয়াংলীর স্বার্থ ?

—কামাখ্যাপ্রসাদ কিছুদিন আগে পর্যন্ত হোয়াংলীর দলে ছিল। তবে বিশেষ কারণে সে হোয়াংলীর দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই কারণেই হোয়াংলী লোক লাগিয়ে তাকে খুন করায় বলে আমাদের ধারণা।

—কামাখ্যাপ্রসাদ হোয়াংলীর দল ত্যাগ করল কেন ?

—সেটা আমরা জানলেও বলতে চাই না।

—আচ্ছা, আর একটা কথা। তোমরা কেন এ সব কথা আমাদের জানাচ্ছ ? কি তোমাদের স্বার্থ ?

—আমরা চাই না হোয়াংলীর মতো শয়তান সমাজে প্রশ্রয় পাক। এ কথা সত্যি যে বেআইনী কাজ আমরাও করি। আইনের পথ ধরে চলি না আমরাও। কিন্তু তবু এতটা নীচতা ও ভয়াবহতা আমরাও সহ্য করতে পারি না।

এ জন্যেই গ্রীন ড্রাগনের সঙ্গে হোয়াংলীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলেছে অবিরত। এসব ঘটনাগুলো আপনাকে জানান দরকার মনে করেছেন গ্রীন ড্রাগন। সব কথা শুনে ব্যবস্থা করতে নিশ্চয়ই পারবেন। আর বিশেষ কিছু বলবার নেই আমার।

বিজলীবাবু কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন। একটা চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে খেলা করতে থাকে। অসীম আঁধারের মধ্যেও তিনি যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পান। ঘটনার জটিলতা যেন তাঁর মনের সামনে অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে।

বিজলীবাবু আপন মনে চিন্তিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকেন।

চার

—পূর্বাপর—

মিনিট খানেক পর টেলিফোনের রিসিভারটা আবার তুলে নেন বিজলীবাবু।

—হ্যালো···সাউথ ডব্‌ল্ থ্রি ফোর এইট্···

—ইয়েস্ প্লীজ্।

—কে কথা বলছেন?

—চ্যাটার্জী স্পীকিং।

—নমস্কার দীপকবাবু! এত রাতেও বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে।

—কি কারণ বলুন না! আমাদের মাঝরাতে টেলিফোন পাওয়ার ব্যাপার ত আর আজ নতুন নয়!

—তা বটে! আচ্ছা, একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি কি একটা কেসে আমার জন্যে একটু সময় স্পেয়ার করতে পারবেন?

—কি ধরনের কেস?

—বিশেষ জরুরী কেস। কামাখ্যাপ্রসাদ নামে একটা লোক অদ্ভুতভাবে নিহত হয়েছে চোরবাগান অঞ্চলের একটা গলির তেরো নম্বর বাড়িতে। তারপর হঠাৎ টেলিফোন পেলাম একজন ক্রিমিন্যালের কাছ থেকে। সে বলেছে যে হোয়াংলী নামে একজন ক্রিমিন্যাল নাকি কামাখ্যাপ্রসাদকে খুন করিয়েছে।

—আচ্ছা, খুনটা হয়েছে কিভাবে?

—পিস্তলের গুলিতে।

—তবে হোয়াংলীকে সন্দেহ করবার কারণ আছে বৈকি। পিস্তল ছুঁড়ে খুন করতেই হোয়াংলী ভালবাসে।

—তাই নাকি? আপনিও তাহলে ওদের সঙ্গে একমত?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, হোয়াংলীর বিষয়ে বিশেষ ধরনের খবর কিছু জানেন?

—অনেক কিছুই জানি!

—যথা?

—আজ পর্যন্ত হোয়াংলী নিজে কোনও বড় ক্রাইম করেনি। কিন্তু সারা ভারতের সব বড় বড় শহরেই তার অনুচর আর দলবল ছড়িয়ে আছে।

—এ খবর আমরা সব না জানলেও কিছু কিছু জানি। এ ছাড়া আর কিছু?

—আর যা কিছু জানি তার সুযোগ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে দেখাতে পারব।

—যাক, আপনি তাহলে এ কেস গ্রহণ করছেন ত?

—নিশ্চয়ই। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ইন্‌ভেষ্টিগেট ইওর কেস।

—আচ্ছা, আপনি আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন, না পৃথক ভাবে তদন্ত করবেন ?

—আপনি ত জানেন, সব সময় পৃথক ভাবে আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করতেই আমি ভালবাসি।

—ধন্যবাদ ! কবে দেখা হবে আপনার সঙ্গে ?

—আমিই বরং থানায় গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে।

—ঠিক আছে। কখন আসছেন ?

—কাল সকাল আটটায়।

—ধন্যবাদ !

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী রিসিভার নামিয়ে রাখে।

* * *

অনিল সামন্তকে নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। অবশ্য অনিল সামন্ত নামে সে সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল।

সেদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাকে দেখা গেল বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে।

বাস থেকে নেমে সে স্টেশনের উল্টো দিকে পথ ধরে হেঁটে চলল হন্ হন্ করে। স্টেশন থেকে পাঁচ সাত মিনিটের পথ কোল ডিপো। লাইনের ধারে বড় বড় মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কয়লা বোঝাই হয়ে।

বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকটস্থ এই ইয়ার্ডে যে হঠাৎ অনিল সামন্তের মতো একজন লোকের আগমন কেন ঘটতে পারে, তা হয়তো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। কিন্তু তাকে অনুসরণ করে ফিরছিল যে একজন কাবুলীর পোশাক পরা লোক, তার ওসব বুঝতে বোধ হয় আদৌ দেরি হয়নি। পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকেই অনিল সামন্তের স্বরূপ সে বুঝতে পারল অনেকটা।

মিনিট তিনেক ইতাতে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। তারপরেই হঠাৎ রেললাইন ধরে হেঁটে আসতে দেখা গেল একজন ঢ্যাঙা চেহারার লুঙি-পরা লোককে।

—আপনি সামন্তসাহেব? লোকটি অনিল সামন্তের কাছে এসে প্রশ্ন করে।

—লোকে তাই জানে বটে। যাক, আসল কথা বলুন এবার!

—আপনি আমাকে চেনেন?

—না।

—তবে এটুকু ত জানেন যে আমি কার লোক?

—তা ত জানিই। আর জানি বলেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি আপনার প্রতীক্ষায়।

—হ্যাঁ। আমি গ্রীন ড্রাগনের লোক। আমি বিশেষ কারণেই সাক্ষাৎ করছি আপনার সঙ্গে।

—বলুন।

—আমি চাই এ কেসে আপনি আমাদের সাহায্য করেন। আপনি যে আসল অনিল সামন্ত নন, তা আমরা জানি। সেই আসল লোকটি কোথায় কি বেশে আছে তাও জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করতে চাই না আপনাকে।

আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—ঠিক তা নয়। এ কথাটা যে আমরা জানি তা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

—তাতে আপনার লাভ?

—বেশি কিছু নয়। আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি আর একটু অবহিত হতে পারবেন!

—বেশ, এবার আসল কথায় আসুন।

—হ্যাঁ, আসল কথা নিয়েই এবার আলোচনা হবে।

—বলুন।

—আমরা চাই, ভেতরের সব খবর খুলে বলেন আমাকে। তার জন্যে যে পারিশ্রমিক দাবি করবেন আমরা দিতে প্রস্তুত।

…এক হাজার টাকা আগাম দিচ্ছি। (পৃষ্ঠা ২২)

—সবটা না জানলেও কিছু কিছু জানি। কিন্তু কতটা আপনার গ্রীন ড্রাগনের পারিশ্রমিকের অঙ্ক তা না জানলে আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই না।

—আপনার দাবি কত?

—দু হাজার টাকা!

—বেশ, তাই পাবেন। এই নিন, এক হাজার টাকা আগাম দিচ্ছি।

গ্রীন ড্রাগনের প্রেরিত লোকটি হঠাৎ ফতুয়ার ভেতরের পকেট থেকে কয়েকখানা একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয় অনিল সামন্তের হাতে।

অনিল সামন্ত টাকাগুলো পকেটে রেখে বলে—কাল তাহলে বেলা দশটা নাগাদ এস্‌প্লানেডের মোড়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি একটা কাগজে সব কথা লিখে আপনার হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

—ধন্যবাদ!

অনিল সামন্ত ধীরে ধীরে পথটা ধরে এগিয়ে যায় বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে।

কাবুলীর পোশাক-পরা যে লোকটা এতক্ষণ অনিল সামন্তকে অনুসরণ করে ফিরছিল সে এবার অনুসরণ করতে থাকে দীর্ঘদেহ লুঙি-পরা গ্রীন ড্রাগনের লোকটিকে।

ভাল করে চেয়ে দেখলে বোঝা যেত যে সে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর অনুচর রতনলাল ছাড়া অন্য কেউ নয়।

পাঁচ

—পশ্চাতে—

এদিকে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীও কিন্তু দস্যু হোয়াংলীর ব্যাপারে নীরব দর্শক ছিল না। কিন্তু সে যে পথে অগ্রসর হয়েছিল তা পুলিস তদন্ত চলেছিল যে পথ ধরে তার ঠিক বিপরীত পথ।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে এসপ্লানেড থেকে এগিয়ে চললে রয়্যাল সিনেমার ঠিক উল্টোদিকের গলির ভিতরে একটা বড় হোটেল দেখা যায়। একটি কুখ্যাত এসিয়ান হোটেল। এসিয়ান হোটেলের ম্যানেজার একজন বাঙালী লোক। কিন্তু তার আসল মালিক যে হোয়াংলী এবং হোয়াংলী বিশেষ উদ্দেশ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এই হোটেলটি কিনেছিল এসব তথ্য দীপকের জানা ছিল। সে তাই ছদ্মবেশে সেদিন দুপুরে এই হোটেলে লাঞ্চ খেতে এসেছিল গোপনে তদন্তকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়েই।

দীপক এখানে এসেছিল একজন ধনী পাঞ্জাবী যুবকের ছদ্মবেশে। অনেক ধনী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এই হোটেলটাতে লাঞ্চ খায় এ তথ্য দীপকের জানা ছিল। আর এই হোটেলের কর্তৃপক্ষ সুন্দরী নারীর লোভ দেখিয়ে বড় বড় পার্টিকে খুশী করে তাদের কাছ থেকে বেশ দু পয়সা উপার্জন করেন এটাও জানত দীপক। সেও তাই এই বেশভূষাটাই পছন্দ করেছিল।

এসিয়ান হোটেলে পা দিতেই একটি সুন্দরী দোহারা চেহারার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। বলে—আপনি কি হোটেলে ফ্ল্যাট ভাড়া নেবেন সিংজী?

দীপক হেসে বলে—না না, আমি শুধু লাঞ্চ খেতে এসেছি।

দীপকের অভিজাতসুলভ মূল্যবান বেশভূষার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে মেয়েটি। তারপর বলে—ভেতরের কেবিনে চলুন।

দীপক মেয়েটির অনুসরণ করে।

ভেতরে গিয়ে দীপক দেখে বেশ মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত কেবিনটি। সে টেবিলে খেতে বসে। মেয়েটি ভেতরে চলে যায় অর্ডার সার্ভ করবার জন্য বয়কে নির্দেশ দিতে।

একটু পরেই মেয়েটি ফিরে আসে।

দীপকের পাশে বসে পড়ে হেসে বলে—আপনার জন্যে ফার্স্ট ক্লাস লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে এলাম সিংজী।

—তাই নাকি? এর চার্জ কত?

—মাত্র সাত টাকা। আপনার মত লোকের কাছে এমন কিছু বেশি না। যাক্, আমি আপনার কাছে বসব ত?

—বসবেন মানে? বসতে আর আপত্তি কি?

—না, মানে বসলে আমরা আগেই চার্জ ঠিক করে নিই কিন্তু!

বিস্মিত ভঙ্গীতে দীপক বলে—বসবার চার্জ মানে?

মেয়েটি বলে—যদি হোটেলে কোনও পার্টির সঙ্গে গল্প করতে হয়, তবে আমরা ঘণ্টা পিছু পাঁচ টাকা চার্জ নিই।

দীপক হাসিমুখে বলে—ধন্যবাদ, আমার ত আপনাকে কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি বরং অন্য লোকের সন্ধান করুন।

মেয়েটি যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে চলে যায়।

* * *

মিনিট কুড়ি কেটে যায়।

দীপকের খাওয়া শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার মন পড়েছিল অন্যদিকে। সে শুধু একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেছিল, এখান থেকে কোনও সূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা সেইদিকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়েটারের হাতে টাকাটা দিয়ে দেয় দীপক। সে চলে গেলে দীপক দেখে কেউ নেই এদিকে। চারধার একেবারে ফাঁকা।

দীপক দেখে সোজা উঠে গেছে হোটেলের দোতলার সিঁড়ি। দীপক তাই বাইরে বের না হয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল।

প্রায় প্রত্যেক ঘরই বাইরে থেকে বন্ধ। সবার শেষে একটা ঘর খোলা। ঘরটা শুধু ভেতর থেকে ভেজানো। দীপক বাইরে থেকে কান পাতল।

যেন চারজন লোক কথা বলছে শোনা গেল। একজন বলল—এইবার থেকে আমি দলের প্রত্যেকটি লোককে এই কথাই জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকেও কামাখ্যাপ্রসাদের মতো শাস্তি পেতে হবে।

এর ভিতরে একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়— কিন্তু তাতে কি সবকিছু বন্ধ হবে?

—নিশ্চয়!

—আমার মনে হয় তাতেই হবে না। কারণ তোমার নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্যে এদিকে পুলিশ ও রহস্য-অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে।

—তা আমিও আন্দাজ করেছি।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী বর্তমান মুহূর্তে যে এই হোটেলেই আছে আমি তা জানি। সকলের চোখে ধুলো দিতে পারলেও সুখানের চোখে ধুলো দিতে পারেনি সে!

দীপক বুঝতে পারে তার হোটেলে উপস্থিতির কথা ওরা জানতে পেরেছে। তক্ষুনি তার উপরে আক্রমণ হওয়াও বিচিত্র নয়।

সে তাই দ্রুতপায়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাতে উঠে অদৃশ্য হয় সেখান থেকে।

ছয়

—অন্য একটি অঙ্ক—

এবার নতুনতর ঘটনার সামনে গিয়ে মোড় ফিরছে আমাদের কাহিনী। এর সঙ্গে পূর্বের অংশের কতটা সম্বন্ধ আছে তা জানবার আগে সম্পূর্ণ ঘটনাগুলির বিষয়ে আপনাদের অবহিত হওয়া উচিত।

শোভার রাজবাড়ি থেকে সেদিন বিকেলে একজন ভদ্রলোককে বের হতে দেখা গেল। সঙ্গে তাঁর একটি মহিলা।

ভদ্রলোকের পরনে দামী তাঁতের কোঁচানো ধুতি। দামী সিল্কের পাঞ্জাবি। মুখে সিগারেট।

সঙ্গের মহিলাটি যদিও যৌবনসীমা অতিক্রম করেনি, তবে তাঁকে দেখলে মনে হয় যে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় তিনি হয়ত শীঘ্রই পা দেবেন।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বড়রাস্তার মোড়ে এগিয়ে এলেন। তারপর চেপে বসলেন হাওড়াগামী একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল হাওড়ার উদ্দেশে।

ভদ্রলোক মহিলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—এদের কিরকম মনে হলো?

—মন্দ নয়।

—শিকার গাঁথবে ত?

—হলে আশ্চর্য হব না। তবে না হওয়াও বিচিত্র নয়।

—তোমার এ ধারণার কারণ?

—কারণ অতি সহজ। যতটা বোকা এদের মনে করেছ এরা ততটা নয়।

—কিন্তু তুমি ত আমাকে নতুন দেখছ না জোহ্‌রা। কি করে এদের বাগ মানাতে হয় তা আমি ভালই জানি।

—সেইটুকুই ত ভরসা! মহিলাটি মৃদু হাসে।

—যদি নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারে ভরসা না পাওয়া যায়, তবে এটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। অনর্থক সময় নষ্ট করবার উপায় নেই আর আমাদের। কাজ এত বেশি, কিন্তু সে তুলনায় হাতে সময় নেই এতটুকু।

—এদিকে শুনলাম গ্রীন ড্রাগন লেগেছে কর্তার পেছনে।

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাদের বিপদও ত কম নয়!

—তা ত বটেই।

—আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিটি কাজ ঠিক করতে হবে অনেক কিছু চিন্তা করে।

—এক্জ্যাক্টলি। কিন্তু আমি তোমাকে বার বার বলেছি হোয়াংলীর দল ছেড়ে দাও!

—এত টাকা অন্য কে অ্যাড্‌ভান্স দেবে শুনি? তা ছাড়া টাকা দেওয়া ত ওদের কাছে মাত্র কথার কথা! হোয়াংলীর মতো এত দিলদরিয়া মেজাজের লোক আর কে আছে বল ত?

—এর চেয়ে আমাদের স্বাধীন ব্যবসা অনেক ভাল ছিল। তাতে কথায় কথায় কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হতো না!

—তুমি এত বেশি নার্ভাস জোহ্‌রা! আমাদের কাজ ত ঠিকমতই চলছে।

—কিন্তু আমাদের বিপদ বহুগুণ বেড়েছে। এই ধর এই নতুন পার্টির কথা। যদি ওরা জানতে পারে যে আমরা এত বড় হোয়াংলীর দলের সঙ্গে জড়িত তবে এইভাবে টাকা উপার্জনের আশা একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

—যাক, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে। আপাততঃ বর্তমানকে নিয়ে চিন্তা করা যাক।

—তা ত হলো। কিন্তু শুধু চিন্তা করলেই ত আর সব প্রব্লেম্ সল্‌ভ্ করা যায় না।

—তা জানি। কিন্তু অবিলম্বে আমরা এই অভিশপ্ত হোয়াংলীর দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করব।

—ভুল করো না। হোয়াংলীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করা যায় না।

—তার মানে?

—তোমার বোধ হয় কামাখ্যাপ্রসাদের কথা মনে আছে। হোয়াংলীর দল ত্যাগ করতে চেয়েছিল বলেই তাকে ওই শাস্তিটা পেতে হলো।

—তা হোক। তবু আর এই বিপদের মধ্যে বেশি জড়িয়ে পড়তে চাই না। মনে রেখো আমরাও এত নিস্তেজ নই যে হোয়াংলীর চোখরাঙানীকে ভয় করব!

—তবে কি করতে চাও?

—আমি চাই শুধু হোয়াংলীর দল ত্যাগ করতে নয়—যেমন করে হোক হোয়াংলীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। তার অন্যায় আর দুর্নীতি আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

কথা শেষ হয় না।

ট্যাক্সি এসে থামে হাওড়া স্টেশনে। দুজনে গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দেয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হঠাৎ লোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—একটা কথা স্যর!

—বলো।

—এই খামটা গাড়ির গদিতে পড়ে আছে। বোধ হয় আপনাদেরই হবে এটা।

লোকটি খামটা হাতে তুলে নিয়ে দেখে তার ওপর বড় বড় হিন্দী হরফে লেখা :

বুলাকীপ্রসাদ শেঠ

উত্তরপাড়া।

লোকটা বলে—এটা ত দেখছি আমারই চিঠি।

সে খামের মুখ খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে খানিকদূর এগিয়ে গেছে।

সাত

—গ্রীন ড্রাগনের কীর্তি—

ভাল করে চিঠিতে মনঃসংযোগ করল বুলাকীপ্রসাদ। এই চিঠি যে তাকে উদ্দেশ্য করে কোনও আগন্তুক প্রেরণ করেছে তা বুঝতে তার আদৌ কষ্ট হয়নি।

চিঠিতে লেখা :

প্রিয় বুলাকীপ্রসাদ,

তুমি আর তোমার সহকারিণী জোহ্রা যে হোয়াংলীর দল ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছ তা আমার অজ্ঞাত নেই।

আমার নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। আর আমার কর্মক্ষমতা যে কতটা তাও বুঝতে বোধ হয় কষ্ট হয়নি তোমার ?

শোন বুলাকীপ্রসাদ, হোয়াংলীর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন আমরা। কিন্তু আমরা চাই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো ওর স্মৃতিকে অবলুপ্ত করতে।

তুমি হয়ত জানতে চাইবে কেন আমি হোয়াংলীর ওপর এতটা অসন্তুষ্ট হয়েছি। শোন বুলাকীপ্রসাদ, আমরা হয়ত নিষ্ঠুর, কঠোর, আইনঅমান্যকারী ক্রিমিন্যাল হতে পারি কিন্তু আমরাও হোয়াংলীর কর্মপদ্ধতির ভয়াবহতা শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠি। মানুষের প্রাণের দাম তার কাছে একটা খোলামকুচির চেয়ে বেশী নয়। আর সে নিজেকে মনে করে ক্রাইম্ ওয়ার্লডের সম্রাট্। তুমি আমি বা অন্য সকলে নির্বিচারে তার হুকুম মেনে চলবে এই সে চায়।

হোয়াংলী যে কত বড় ধূর্ত শয়তান তা তোমাকে আর নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না বলেই মনে করি আমি।

কামাখ্যাপ্রসাদের মতো লোককে যে হত্যা করতে পারে তার অসাধ্য কোনও কাজ পৃথিবীতে নেই।

তুমি আর জোহরা ইচ্ছা করলে আমাকে অনেকটা সাহায্য করতে পার।

অবশ্য প্রত্যেকটি লোকের কাজের জন্যেই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে থাকি আমি। যদি হোয়াংলীর বিরুদ্ধে আমার এ অভিযানে তোমরা আমাকে সাহায্য কর, তবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করতে সচেষ্ট হব আমি।

যদি আমার প্রস্তাবে তোমরা সম্মত হও, তবে আজ সন্ধ্যায় উত্তরপাড়া ব্রিজের ধারে অপেক্ষা করো। আমার পরবর্তী নির্দেশ তুমি সেখান থেকেই পাবে।

আর যদি আমার আদেশ তুমি অবহেলা কর, তবে তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কসুর করব না আমি। ইতি—

গ্রীন ড্রাগন।

চিঠিখানা শেষ করে বুলাকীপ্রসাদ বলে—সত্যি, ক্ষমতা যে ওদের আছে তা স্বীকার করতেই হবে জোহ্‌রা।

—কেন?

—এত বড়ো দল যে ওদের হাতে তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আমাদের মতো ক্রিমিন্যালের চোখে ধুলো দিয়ে যে চিঠিটা দিয়ে গেল, তাতে ত আর সন্দেহ নেই আমাদের।

—কিন্তু হোয়াংলী কি সব ঘটনা শুনলে অত্যন্ত ক্ষেপে উঠবে না? জোহ্‌রা প্রশ্ন করে।

—তা উঠতে পারে। কিন্তু আমিও বুলাকীপ্রসাদ। আমার আত্মীয়ের গায়ে হাত তোলা যে কত বড় অন্যায় তা আমি তাকে মজ্জায় মজ্জায় শিখিয়ে দেব।

দুজনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে মনঃস্থির করে ফেলে।

—হোয়াংলীর দলে আর একদিনও থাকা উচিত নয়। যেখানে ভাল নতুন গ্রূপ দেখা যাচ্ছে সেখানেই যোগ দেব আমরা।—বুলাকীপ্রসাদ বলে।

* * *

ঠিক সেই দিন বিকেলে ছটার শো'তে কোলকাতার একটি বিখ্যাত হল থেকে বেরিয়ে এলো একটি ইউরোপীয়-বেশভূষা-পরা যুবক আর একটি মেয়ে।

যুবকের চেহারা দেখে তাকে বিদেশী বলে মনে হয়। বোধ হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কি আমেরিকান হবে। পরনে গ্যাবাডিনের দামী স্যুট ও গলায় বো-টাই। মুখে পাইপ।

—গুড্ ইভ্‌নিং স্যর…

পাশ থেকে একজন পাজামা আর পাঞ্জাবি-পরা লোক কথাটা বলে উঠল।

—গুড্ ইভ্নিং! তারপর বিনায়ক, তোমার খবর কি?

—খবর বিশেষ জরুরী।

—তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের এখন কি করা কর্তব্য বল।

—চলুন আমাদের দু নম্বর ঘাঁটিতে গিয়ে আলোচনা করা যাক। আপনার ঘোষণা না পেলে ত আর দলের কেউ কাজে হাত দেবে না স্যর!

—তা জানি। কিন্তু কি তোমার খবরগুলি তা আগে জানা প্রয়োজন। না হলে শুধু ঘোষণা শুনিয়েই ত আর কাজ হবে না।

—তা আমার অজানা নয় স্যর। চলুন, বাইরে মোটর অপেক্ষা করছে। আপনি যে এখানে আসবেন তা আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন। কাজেই মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছি আমি প্রায় আধঘণ্টার ওপর।

—বেশ চল। তুমি যাবে সুশান? মেয়েটির দিকে চেয়ে লোকটি প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে হোয়াংলী। দলের অগ্রগতির প্রতিটি খবর আমার জানা উচিত।

—বেশ, চল তবে।

তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এসে একটি মোটরে চড়ে বসে। মোটর দ্রুত ছুটে চলে খিদিরপুরের দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে খিদিরপুরের নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে মোটরটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

ছোট একটা বাড়ি। দোতলা। আশেপাশে বিশেষ বাড়ি নেই। যেও একখানা আছে, তারা এই অদ্ভুত বাড়ির ভেতরের কোনও খবর এতটুকুও

জানতে পায় না। শুধু জানে বিনায়ক নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক এই বাড়িতে থাকে।

এরা তিনজনে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবার আগে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিল হোয়াংলী। তার মুখখানা তখন কেমন থমথমে দেখাচ্ছে।

আট

—দীপক ও রতন—

বিজলীবাবুর কাছ থেকে কামাখ্যাপ্রসাদের মার্ডার কেস সম্বন্ধে সব ঘটনা শুনে কেসটা সম্বন্ধে দীপক রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তার সারা মন জুড়ে খেলা করছিল একটা অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা। একটি অদ্ভুত নতুন ধরনের কৌতূহল।

সামান্য একটা ক্রিমিন্যালের মার্ডারের সঙ্গে যে হোয়াংলী আর গ্রীন ড্রাগন নামে খ্যাত শহরের দুটি দুর্ধর্ষ দল জড়িয়ে থাকতে পারে এটা দীপক প্রথমটা আদৌ বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু বিভিন্ন লোককে অনুসরণ করে করে সে বুঝেছে, সত্যিই এ কেসটার ব্যাপারে জটিলতা কিছু আছে।

সেদিন তাই সে রতনকে নির্দেশ দিয়েছিল অনিল সামন্ত লোকটার ওপর বেশ একটু কড়া নজর রাখতে।

রতন কাবুলীর বেশে তাকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত অনুসরণ করে দেখল গ্রীন ড্রাগনের দলের একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে। রতন কৌতূহলী হয়ে সেই লোকটিকেই অনুসরণ করে চলল।

লোকটা স্টেশন থেকে সোজা হেঁটে চলল শুড বালিগঞ্জের দিকে। প্রায় আধঘণ্টা সে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলো হাজরা রোড ক্রসিংএ। সেখানে একটা বড় বাড়ির মধ্যে হঠাৎ এমনভাবে সে প্রবেশ করল, যেন বাড়িটা তার বহুদিনের চেনা।

মিনিট কুড়ি পরে সে সেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো। তখন আর তাকে দেখলে আগের সেই লুঙ্গিপরা লোক বলে মনে হবে না।

নিখুঁত ছদ্মবেশ তার চেহারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে স্যুট। পায়ে দামী ক্রেপসোল সু।

একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সে তাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটে চলল দ্রুতগতিতে।

রতনও তার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল অবিলম্বে। আগের গাড়িকে অনুসরণ করে তার গাড়িও দ্রুত ছুটে চলল প্রশস্ত রাজপথ ধরে।

দুটি গাড়ির মধ্যে দূরত্ব ছিল যথেষ্ট। তাই সামনের গাড়িতে বসে থাকা গ্রীন ড্রাগনের অনুচর কল্পনাও করতে পারল না যে, পেছনের গাড়িতে যে লোকটা আসছে সেই ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর অনুচর রতনলাল।

গাড়ি এসে সোজা থামল হাওড়া স্টেশনে। সেখানে নেমে লোকটা এগিয়ে গেল টিকেট-ঘরের দিকে।

রতন দেখল লোকটা টিকেট কেটে ব্যাণ্ডেল লোকালে চড়ে বসল। রতনও সোজা গার্ডের কামরায় গিয়ে তাঁকে কয়েকটা কথা বলে আর তার কার্ডটা দেখিয়ে সেখানে জায়গা করে নিল।

উত্তরপাড়ায় এসে লোকটা নামল।

রতনও নেমে দূর থেকে লোকটার ওপর নজর রাখল। সে বেশ স্পষ্ট

বুঝতে পারল গ্রীন ড্রাগনের অনুচরের আগমন এখানে বিনা কারণে ঘটেনি।

রতনের অনুমান মিথ্যা নয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গ্রীন ড্রাগনের অনুচর সোজা রওনা হলো উত্তরপাড়া পোলের দিকে।

রিক্শা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে কারও জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট দুয়েক পর।

যে লোকটাকে পোলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে ক্রাইম ওয়ার্লডের সকলে বুলাকীপ্রসাদ বলে জানে।

রতন বুঝল, বুলাকীপ্রসাদের সঙ্গে এই লোকটির যোগাযোগ বিনা কারণে ঘটেনি। নিশ্চয়ই আগে থেকে বুলাকীপ্রসাদকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল।

গ্রীন ড্রাগনের লোকটা এগিয়ে গিয়ে বুলাকীপ্রসাদের সঙ্গে বিড় বিড় করে কয়েকটা কথা বলল। তারপর বুলাকী একটা লেফাফা তুলে দিল তার হাতে।

বুলাকী আরও কি যেন কথা বলল।

কথাগুলো শুনতে না পেলেও রতন বুঝতে পারল বুলাকী কোনও কাজের জন্যে মজুরী চাইছে।

গ্রীন ড্রাগনের অনুচর তার হাতে দিল কতকগুলি দশটাকার নোট। তারপর দু একটা কথা বলে লোকটা অদৃশ্য হলো।

এতক্ষণে রতনের ধারণা হয়েছে যে তার এতদূরে আসা ব্যর্থ হয়নি। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে কাজ করে এটুকু

সে বুঝতে শিখেছে যে কোন্ সময়ে কোন্ লোককে হঠাৎ আক্রমণ করলে কাজ আদায় করা যায়।

—বুলাকী! হঠাৎ রতন পেছন থেকে ডাক দেয়।

—কে?

বুলাকী যেন অতিমাত্রায় ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

—আমি হোয়াংলী নই!

—ও, আপনি। রতনবাবু। বুলাকীর ঠোঁটে হাসি ফোটে।

—হ্যাঁ, তারপর তোমার কারবার কেমন চলছে?

—কারবার?

—হাঁ, তোমাদের সেই লোক-ঠকানো স্মাগ্‌লিং বিজনেস্!

—মন্দ নয়।

—তারপর, হোয়াংলীর দলে যোগ দিয়েছিলে বলে শুনেছি।

—না না, এ সব কি বলছেন বাবু!

—ঠিকই বলছি। বুদ্ধিটি করেছ খাসা! এদিকে হোয়াংলীর সঙ্গে কাজ করছ, আবার গ্রীন ড্রাগনের টাকাও খাচ্ছ। তোমার বুদ্ধির তারিফ করি বুলাকীপ্রসাদ!

—এ সব আমি চাই না বাবু!

—তবে এ সব কি তোমার সেই জোহ্‌রার বুদ্ধি?

—তা জানি না। তবে নিমকহারামি বুলাকীপ্রসাদ জীবনে করে না বাবু। এখন এটা করছি বাধ্য হয়েই। হোয়াংলীর মতো শয়তানের দলে কাজ আমি আর করব না বাবু!

—কথাটা মনে থাকবে ত?

—হ্যাঁ বাবু। দেখে নেবেন, যা কথা তাই কাজ আমি করি।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে গ্রীন ড্রাগন কতদিন এভাবে টাকা দিচ্ছে ?

—এই প্রথম !

—কত পেলে ?

—মিথ্যা বলব না বাবু, আর আপনি আমার নাড়িনক্ষত্র জানেন, আপনার কাছে মিথ্যা বলে কোনও লাভ নেই। পাঁচশো টাকা আমি পেয়েছি।

—ওটা কি ? ওই যে খামটা তুমি গ্রীন ড্রাগনের অনুচরের হাতে দিলে ?

—হোয়াংলীর মৃত্যুবাণ !

—তার দাম মাত্র পাঁচশো ?

—আরও পাঁচশো পাব। আর ওটা শুধু দামে বিক্রি হয় না বাবু। সে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আমিও ওটা দিতাম না বাবু !

—ওতে কি আছে ?

—হোয়াংলী আজীবন যতো অন্যায় করেছে তার প্রমাণপত্র।

—কিন্তু আমার ওটা পেলে কাজ হতো। গ্রীন ড্রাগন ওটা নিয়ে কি করবে ?

—সেটা সেই ভাল বুঝবে। পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে আমি চাই না বাবু !

—কিন্তু কাজটা কি ভাল করলে বুলাকী ? কামাখ্যাপ্রসাদের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি !

—জানি বাবু। আপনার চেয়েও ভাল করে জানি !

—তার মানে ?

—সে আমার দূরসম্পর্কের ভাই। তবে তাকে আমি নিজের ভাইয়ের চেয়েও ভালবাসতাম !

…রিভলভার তুলে ধরে ঝোপের দিকে। (পৃষ্ঠা ৩৯)

—সেকি কথা ? সব কিছুই যে গোলমেলে ঠেকছে। সেই জন্যেই কি তুমি হোয়াংলীর ওপর খড়্গহস্ত ?

—শুধু সেইটাই নয় আরও অনেক কারণে। সবই ক্রমশঃ জানতে পারবেন বাবু। আচ্ছা চলি।

বুলাকী পায়ে পায়ে কিছুটা এগিয়ে যায়।

রতন কি করবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ পর পর দুবার শোনা যায় পিস্তলের শব্দ।

রতন ছুটে যায়।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন বুলাকীপ্রসাদকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

বুলাকী লুটিয়ে পড়ে পথের ওপর। রতন ছুটে গিয়ে তার রিভলভার বের করে তুলে ধরে ঝোপের দিকে। কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায় না সেখানে।

বুলাকী ততক্ষণে উঠে বসেছে।

একটা মাত্র গুলি লেগেছিল তার ডান হাতে। সামান্য একটু চামড়া ছড়ে গেছে মাত্র।

বুলাকী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—দেখলেন বাবু, এ নিশ্চয়ই হোয়াংলীর কোনও অনুচর !

রতন বলে—তা ত বুঝছি। কিন্তু তুমি এক্ষুনি কোন ডাক্তারের কাছে চলো। ক্ষতটা এক্ষুনি ব্যাণ্ডেজ করা উচিত।

দু জনে ডাক্তারখানার উদ্দেশে পা বাড়ায়।

নয়

—সংঘর্ষের সূচনা—

হোয়াংলী আর তার দলের একজন লোক বিনায়ক খিদিরপুর অঞ্চলের একটা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। সঙ্গে তাদের সুখান নামে মেয়েটা—দস্যু হোয়াংলীর ডানহাত। হোয়াংলীর প্রতিটি কাজে সুখানের পরামর্শ তার অবশ্যই চাই!

হোয়াংলীর মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল। দোতলার একটা ঘরে বসে সে বিনায়কের দিকে চেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল—এবার তোমার কথা আরম্ভ কর বিনায়ক।

বিনায়ক একটু চিন্তিতস্বরে বলল—কথা আরম্ভ করবার আগে একটা কথা বলা উচিত মনে করি।

—কথা?

—আমার কথাকে আপনি যতো seriously নিন না কেন, যেন তা আপনাকে আঘাত না করে।

—অর্থাৎ তুমি এমন কোনও সংবাদ এনেছ যা আমার বিপদের সংকেত বহন করছে?

—এক্‌জ্যাক্টলি!

—তাহলে শোন বিনায়ক, আমার বিরুদ্ধে যে বিরাট একটা দল গঠিত হয়েছে তা আমারও অজানা নয়। কিন্তু আমি তাদের বিরুদ্ধে চট্ করে অগ্রসর হতে চাই না শুধু কয়েকটা কারণে।

—কি কারণ?

—আমার দলের লোকের বিরুদ্ধে স্টেপ্ নেওয়া আগে চাই। বাইরের লোকেদের একটু চেষ্টা করলেই কন্ট্রোল করা যায়, কিন্তু নিজেদের লোক যদি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে, তবে তাদের আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে কোন্ পথে?

হোয়াংলীর কথা শুনে বিনায়ক মিনিটখানেক কি যেন ভাবল! তারপর বলল—আমি জানি আপনি চিন্তিত হয়েছেন। প্রথমে কামাখ্যাপ্রসাদ যেমন আমাদের দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল, তেমনি পর পর কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে বুলাকীপ্রসাদ আর জোহ্‌রা।

—হ্যাঁ, এদের আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এরা যে এতটা এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসভঙ্গ করবে তা আমি কল্পনাও করিনি। কিন্তু এমন কাজ যে কেন করল তা তুমি জান বিনায়ক?

—জানি।

—কি এর কারণ?

—মূল কারণ হচ্ছে বুলাকীপ্রসাদ হচ্ছে কামাখ্যাপ্রসাদের ভাই।

—তুমি এ কথা কি করে জানলে?

—বিশেষভাবে সংগ্রহ করেছি।

—বেশ। তোমার কাজে আমি খুশী হয়েছি বিনায়ক। তুমি যে বেশ ভালভাবেই আমার গুপ্তচরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছ তা বুঝলাম। এখন বুলাকী কি তার নিজস্ব ধরনে আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে?

—না।

—তবে?

—সে গ্রীন ড্রাগন নামে খ্যাত দস্যুদলের সঙ্গে যোগাযোগে এ কাজ করতে চায়।

—গ্রীন ড্রাগন কি করে জানল যে বুলাকীপ্রসাদ আমার দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে?

—তা জানতে কি বেশি দেরি হয় প্রভু?

—না, তা হয় না। তবে আমিও একজন দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল। যদি বুলাকীপ্রসাদের মতো সামান্য লোককে শায়েস্তা না করা যায়, তবে মিথ্যাই আমার গর্ব। অহংকার।

—না, আপনার গর্ব মিথ্যা নয় প্রভু। আমি চাই আপনি উপযুক্ত পদ্ধতিতে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

—বেশ। সে ভার আমি তোমাকেই দিতে চাই বিনায়ক।

কথায় বাধা দেয় সুবান। বলে—বুলাকীর মতো লোকের বিরুদ্ধে একা বিনায়ক কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না আমার!

বিনায়ক বলে—আমার ওপর এটুকু বিশ্বাস আপনি করতে পারেন দেবী। আমি প্রমাণ করব, আমি সত্যিই কতটা কর্মক্ষম।

—এখন পর্যন্ত তুমি কতটা এগিয়েছ বিনায়ক?

—আমি বুলাকীর সঙ্গে গ্রীন ড্রাগনের অনুচরের কোথায় দেখা হবে সে খবর যোগাড় করেছি প্রভু!

—কোথায়?

—উত্তরপাড়া পোলের ধারে আজকে সে গ্রীন ড্রাগনের অনুচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

—কেন?

—বোধ হয় আপনার বিরুদ্ধে কোনও জরুরী প্রমাণ গ্রীন ড্রাগন তার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চায়।

—বেশ। তোমার কাজ হবে আজকেই তার সমস্ত কাজ চিরদিনের মতো শেষ করে দেওয়া। এ কাজে সফল হলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে তোমাকে।

—আপনার মর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা আমি করব প্রভু!

বিনায়কের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

দশ

—অতঃপর—

হোয়াংলীর দলের লোকের সঙ্গে বুলাকীর সংঘর্ষের কথা আগেই বলা হয়েছে।

ডাক্তারখানা থেকে ক্ষতটা ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে বুলাকীপ্রসাদ রতন লালের দিকে চেয়ে বলল—আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই বাবু।

—বল।

—আমি দীপকবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—কেন ?

—আমি জানি একবার হোয়াংলী যখন আমার ওপর নজর দিয়েছে তখন সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, বাবু। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এটা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি জানি যে কোনো মুহূর্তে আমার শেষ সময় ঘনিয়ে আসতে পারে। তাই এক্ষুনি একবার দীপকবাবুর সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা তাঁকে বলে আসতে হবে।

—তোমার সুমতি দেখে আমিও খুশী হয়েছি বুলাকীপ্রসাদ।

—সুমতি শুধু আমার হয়নি বাবু, জোহ্‌রাও চায় না যে এই ধরনের দলের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ থাকে।

—বেশ, তবে চল আমরা এই ট্রেনেই কোল্‌কাতার দিকে যাই। কিন্তু তুমি যে খবরের জন্যে বিপদে পড়ছ, দীপকও ত সে খবর শুনে বিপন্ন হতে পারে!

—তা হয়ত পারেন। কিন্তু হোয়াংলীর মতো সামান্য দস্যু যে দীপকবাবুর

কোনও ক্ষতি করতে পারবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। এর চেয়েও অনেক বেশি দুর্ধর্ষ দলের বিরুদ্ধে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তাঁর জীবনে।

—তোমার কথা অবশ্য মিথ্যা নয় বুলাকী। আমি চাই না যে তোমার বিপদ আরও বৃদ্ধি হোক। বরং আমরা এ ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হলে হোয়াংলীর নজর অনেকটা আমাদের ওপর এসে পড়বে। আমরাও সুযোগ পাব তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার। কোনও খবর না জেনে ত আর হাওয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায় না!

—তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা বাবু। আমাকে যেন আপনারা মিথ্যা আটকে রাখবার চেষ্টা করবেন না।

—কেন বল ত?

—আমারও একটা বিরাট দল আছে। তাদের সংঘবদ্ধ করে যদি আমি চেষ্টা করি তবে হোয়াংলীর মতো লোককে জব্দ করতে বেশি সময় লাগবে না। বুলাকীপ্রসাদ জীবনে কখনও কোন শত্রুকে ক্ষমা করেনি।

রতন এ কথায় কোনও উত্তর দেয় না।

তারা দুজনে উত্তরপাড়া স্টেশনে এসে হাওড়াগামী একটা ট্রেনে চেপে বসে।

• • •

রতনের কাছ থেকে সব কথা শুনে দীপককে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হয়। রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলে—আমি বুলাকীপ্রসাদের কাছ থেকে সব কথা শুনছি রতন, তুই ততক্ষণ অন্য একটা কাজ কর!

—কি কাজ?

—আমার মনে হয়, অনিল সামন্তের ওপর থেকে আমাদের নজর সরান উচিত হয়নি।

—কিন্তু গ্রীন ড্রাগনের অনুচরকে বাধ্য হয়েই ফলো করতে হলো। তাই…

—তাহলে তুই এখন একটা কাজ কর। এক্ষুনি অনিল সামন্তের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নে সে বাড়ি আছে কি না।

—যদি না থাকে ?

—তবে অন্য পথ ধরে এগুতে হবে। তাকে হাতছাড়া করা চলবে না। ভুলিস না গ্রীন ড্রাগন মিথ্যা কোনও লোককে আজ পর্যন্ত select করেনি।

—কিন্তু কে এই গ্রীন ড্রাগন ?

—তাও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

—যদি খুঁজে না পাওয়া যায় ?

—তবে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নেই। আপাততঃ আমাদের কাজ হচ্ছে কামাখ্যাপ্রসাদের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা।

—এ কাজ করতে গেলে অনিল সামন্তকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা উচিত কেন ?

—অনিল সামন্ত বিরাট একটা অংশে যে অভিনয় করছে তা জানা আছে আমার। আমার মনে হয়, তাকে অনুসরণ করা উচিত অন্য অর্থেও। হোয়াংলীর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের সে কোনও দিনই ক্ষমা করে না।

রতন আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

এগারো

—নতুন সন্ধান—

চোরবাগানের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে রতন অবাক হয়ে যায়। বাড়ির সামনে একগাদা লোক দাঁড়িয়ে। তেরো নম্বর বাড়িতে যে আবার কিছু ঘটেছে তা বুঝতে রতনের দেরি হয় না।

একজন লোকের দিকে চেয়ে রতন প্রশ্ন করে—এখানে এত লোকের ভিড় কেন তা ত বুঝতে পারছি না।

—আর বলেন কেন বাবু! আবার খুন!

—খুন?

—হ্যাঁ।

—কে খুন হয়েছে?

—অনিল সামন্ত বলে একজন লোক এ বাড়িতে থাকত। তাকে কে বা কারা খুন করেছে।

—এর আগেও কি এ বাড়িতে কেউ খুন হয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ। পরশু এখানে কামাখ্যাপ্রসাদ বলে একজন গুণ্ডাকে খুন করেছিল।

—বুঝেছি।

রতন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবে কিনা ভাবছে এমন সময় বিজলীবাবু এসে পড়েন তাঁর দলবল নিয়ে।

—আরে বিজলীবাবু যে! তারপর, আপনার কি খবর?

—খবর ত দেখতেই পাচ্ছেন! এইমাত্র ফোনে সংবাদ পেলাম তেরো নম্বর বাড়িতে আর একটা খুন হয়েছে।

—আর একটা নতুন লোক নয়। ও আমাদের চেনা অনিল সামন্ত।

—তাই নাকি? অনিল সামন্তকে হঠাৎ আবার কে খুন করল!

—তা জানি না। তবে ক্রিমিন্যালকে খুঁজে বের করতে আর বেশি বেগ পেতে হবে না আমাদের।

—তার মানে?

—অনিল সামন্তের হত্যাকারী আর কামাখ্যাপ্রসাদের হত্যাকারী যে একই লোক তো আমি জানি। দীপকও জানে। আর সেই লোককে খুঁজে

বের করবার উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা। কিন্তু এসেই দেখতে পেলাম এই ব্যাপার ঘটে গেছে।

—দীপকবাবু কোথায়?

—সে এখন বুলাকীপ্রসাদ নামে একজন লোকের কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করবার কাজে ব্যস্ত আছে।

—কোথায়?

—বাড়িতে।

—বুলাকীপ্রসাদ কি হোয়াংলীর দলের লোক?

—হ্যাঁ, আগে তাই ছিল। তবে বর্তমানে সে ও-দল ত্যাগ করেছে।

—যাক্, চলুন আপাততঃ মৃতদেহটা দেখা যাক। তা থেকে কিছু না কিছু সূত্র পাব বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—চলুন।

সকলে দোতলায় গিয়ে কমলার ঘরের সামনে উপস্থিত হয়।

কমলা ঘরের মধ্যে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার থেকে সামান্য দূরে খাটের ওপর শায়িত ছিল অনিল সামন্তের দেহ। পিঠে একখানা ছোরা আমূল বিঁধানো। রক্তে বিছানা ভিজে গেছে।

মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন বিজলীবাবু। আর মৃতদেহের আইডেন্টিফিকেশন জানবার জন্যে তার একখানা ফটো তুলে নেন তিনি।

অবশেষে কমলাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করেন বিজলীবাবু।

প্রশ্নের উত্তরে কমলা জানায় যে, সে সময়ে সে ঘরে ছিল না। অনিল সামন্তের কাছে একটা চাবি থাকত সব সময়। সেই চাবি দিয়ে ঘর খুলে সে ঘরে এসে বসেছিল হয়ত। তারপর কি ঘটেছে তা সে জানে না। ফিরে

পিঠে একখানা ছোরা আমূল বিঁধানো (পৃষ্ঠা ৪৭)

এসে দেখে যে অনিল সামন্ত বিছানার ওপর পড়ে আছে। তার পিঠে একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ।

বিজলীবাবু একটু অবাক হন। প্রশ্ন করেন—অনিল সামন্তকে ছোরা মারা হলে সে কোনও চীৎকার করেনি? এ বাড়িতে কেউ কি জানতে পারেনি যে এতবড়ো একটা হত্যাকাণ্ড ঘটছে?

—না। কমলা বলে—সেটাই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

রতন বিজলীবাবুর দিকে চেয়ে বলে—হয়ত আচমকা মুখে ক্লোরোফর্ম-ভিজান রুমাল চেপে ধরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। তাই অনিল সামন্ত কোনও চীৎকার করতে পারেনি।

—তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তবু কেসটা কেমন যেন আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

—কেন?

—এক্ষেত্রে ছোরা দিয়ে খুন করা হলো কেন?

—সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। হয়ত পিস্তলের শব্দ অন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তাই।

—এটা অবশ্য সম্ভব। বিজলীবাবু যেন একটা পথ খুঁজে পান। বলেন—মোটামুটি এদিকের সব প্রব্লেম্ সল্‌ভ্ হয়ে গেল। শুধু একটা কাজ বাকী। আপনি মিঃ চাটার্জীকে একটা টেলিফোন করুন রতনবাবু।

রতন বলে—না, আমি নিজেই যাব। তার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করা প্রয়োজন।

—তাহলে ত আর কথাই নেই। সব কথা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে বলতে পারবেন! এ সকল জটিল কেসের সমাধান তিনি ছাড়া আর কেউ যে সহজে করতে পারবে না তা বুঝি।

রতন এ কথা শুনে একটু হাসে। বলে—আপনি ভুল করছেন, বিজলীবাবু। এ সব কেসের প্রব্‌লেম্‌ অনেক আগেই সল্‌ভ্‌ হয়ে বসে আছে। শুধু শেষটুকু যা বাকী!

—তা বটে। আপনারা কতদূর এগিয়েছেন সে সংবাদ অবশ্য আমরা রাখি না।

রতন বিজলীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। বিজলীবাবু লালবাজারের দিকে যান অনিল সামন্তের ফটোটা একবার ভেরিফাই করবার উদ্দেশ্যে।

বারো

—নতুন চমক—

রতন কিন্তু দীপককে বাড়িতে পেলো না। বের হয়ে যাবার আগে সে রতনের নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

রতন চিঠিখানা ভাল করে পড়ে বুঝতে পারল, দীপকের দূরদৃষ্টি কত বেশি। যে কোনও কাজ সে কত আগে থেকেই সম্পূর্ণ বুঝে নিয়ে তা ধরে এগুতে পারে।

চিঠিতে লেখা ছিল :

রতন,

তুই ফিরে এসে দেখবি আমি বাইরে গেছি। আমাকে বিশেষ কারণেই বাইরে যেতে হচ্ছে।

যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমার কাছ থেকে কোনও সংবাদ জানতে না পারিস, তবে বুঝবি আমি বিপদে পড়েছি।

অনিল সামন্ত আসলে প্রকৃত অনিল সামন্ত নয়। প্রকৃত অনিল

সামন্ত প্রায় দু বছর আগে মারা গেছে। এই নকল লোকটির পরিচয় পরে জানবি। অনিল সামন্তের জীবন বিপন্ন। হয়ত তুই এসে বলবি যে সে মারা গেছে। কিন্তু তার আগেই আমি বাইরে। তাই তুই সময় নষ্ট না করে বিজলীবাবুকে জানাবি যে আমি হোয়াংলীকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবার জন্যে একটা গুপ্ত আড্ডায় হানা দিয়েছি।

শোন, আমি যাচ্ছি খিদিরপুরে হোয়াংলীর আড্ডার উদ্দেশে। খবরটা পেয়েছি বুলাকীপ্রসাদের কাছ থেকে। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে কোন খবর না পাস তবে বিজলীবাবুকে নিয়ে রওনা হবি সেখানে।

প্রীতি অন্তে—

দীপক।

ঠিক এ ধরনের চিঠির জন্যে রতন তৈরী ছিল না। দীপক যে চুপচাপ বসে নেই তা সে জানত, কিন্তু তার দূরদৃষ্টি যে এত বেশি তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ঘর থেকে বের হবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ঘন ঘন বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভার তুলে নিয়ে রতন প্রশ্ন করল—হ্যালো, কে?

—আমি বিজলীবাবু। আপনি কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—না, আমি রতনলাল। দীপক বাইরে গেছে হোয়াংলীকে আটক করবার উদ্দেশ্যে। একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে যে, যদি এক ঘণ্টার বেশি দেরি করে তবে আমরা যেন তাকে অনুসরণ করি।

—কোথায় গেছেন?

—খিদিরপুর।

—কতক্ষণ?

—প্রায় এক ঘণ্টা।

—আচ্ছা আমি আসছি। তার আগে একটা বিশেষ খবর আছে। লালবাজারে পুরানো ক্রিমিন্যালদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, অনিল সামন্ত ও লোক নয়। তার ছবি অন্যরকম ছিল। ও হচ্ছে ক্রাইম জগতের নামকরা ক্রিমিন্যাল দস্যু বিভাস সোম।

—দস্যু বিভাস সোম! তাহলে অনিল সামন্ত কোথায়?

—সে মারা গেছে।

—বুঝেছি। দীপক তাহলে চিঠিতে ঠিক কথাই লিখে গেছে।

—দীপকবাবু এ কথাও লিখে গেছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য ত! আচ্ছা আমি আসছি এক্ষুণি। এ রকম বিপদের মুখে দীপকবাবুকে একা ছেড়ে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

রতন রিসিভার নামিয়ে রাখে।

* * * *

খিদিরপুর অঞ্চলে পৌঁছে বিজলীবাবু শুনতে পান, কাছেই একটা বাড়িতে কিছুক্ষণ আগে রিভলভারের ঘন ঘন গর্জন শোনা গেছে।

—কোথায়? বিজলীবাবু প্রশ্ন করেন।

—মিনিট তিনেকের পথ। ডানদিকে।

বিজলীবাবু গাড়িতে উঠে বসে জোরে স্টার্ট দেন।

* * *

একটা সরু গলি পেরিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে পুলিশ লরী এসে পড়ে।

দীপক পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। হাত তুলে গাড়ি দাঁড় করায়।

—কি খবর স্যর ?

—খবর জরুরী। বুলাকী আমার সঙ্গে এসেছিল। আমরা দু জনে দুটি পিস্তল সম্বল করে ওদের দলের পাঁচ ছ জনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে ওদের আটক করেছি।

—কোথায় ?

—দোতলার ঘরে সুধান, বিনায়ক ইত্যাদিরা বন্দী আছে। হোয়াংলী পালিয়েছে।

—কোন্ দিকে গেছে ?

—তা ঠিক বুঝতে পারিনি।

—বুলাকী কোথায় ?

—সামান্য আহত হয়েছে সে। তার ডান হাতে গুলি লেগেছে।

—আপনারও জামায় ত রক্ত দেখছি।

—হ্যাঁ, আমারও বাঁ হাতে সামান্য চোট লেগেছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এ ধরনের কাজ করতে গেলে মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয় বিজলীবাবু। যাক চলুন, দোতলার ঘরে আপনার সব পাখীরা খাঁচাবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে।

দীপকের রসিকতা শুনে বিজলীবাবু হাসেন। সব সময়ে, সব অবস্থাতেও রসিকতা করতে দীপক সত্যিই জানে!

* * *

উপরে উঠে আসেন বিজলীবাবু। দীপক তাঁর অনুগমন করে। কিন্তু সেখানে পা দিয়ে দেখে আরও একটা বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে।

ঘরটি ঠিকমত তালাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

—এ কি করে সম্ভব ? দীপক অবাক হয়।—এইমাত্র ঘরের মধ্যে ওদের দেখে গেলাম আর এরই মধ্যে ঘর একেবারে ফাঁকা!

বিজলীবাবু ঘরের ডানদিকের দেওয়াল-আলমারিটা খোলেন। আশ্চর্য! আলমারির পাল্লা টেনে খুলতেই দেখা যায় সেখানে একটা গভীর সুড়ঙ্গের মতো।

দীপক বলে—এ ঘরে তাহলে একটা গুপ্তপথ ছিল দেখা যাচ্ছে।

বিজলীবাবু হেসে বলেন—সর্ব অবস্থাতেই ওরা বেশ প্রস্তুত থাকে বলে বোঝা যাচ্ছে। কি বলেন?

সুড়ঙ্গের মুখে রাখা একটা চিঠি:

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

আমাদের দলের লোককে আটক করে আমাকে গ্রেপ্তার করা যতো সহজ মনে করেছিলে, আসলে ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। আমি তাই ওদের এই গুপ্তপথ দিয়ে বের করে নিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও বিপদের সময় আমার দলের লোককে আমি সাহায্য করি সব সময়।

আর আমার পেছনে লেগে মিথ্যা সময়ের অপব্যবহার করবে না বলে আশা করি। আর যদি আমার এই উপদেশবাক্যটি মনে না রাখ, তবে মৃত্যু যে তোমার সন্নিকট তা নিশ্চিত করে জেনে রাখতে পার। আমার হাত থেকে তাহলে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

ইতি—

তোমার বন্ধু

হোয়াংলী।

তেরো

—দ্বৈরথ—

মাসখানেক পরের ঘটনা।

নির্জন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বেগে মোটরগাড়ি চালিয়ে কোল্কাতায় ফিরে আসছিল দীপক। দীপকের পাশে বসে ছিল তন্দ্রা। অনেকদিন থেকে তন্দ্রার ইচ্ছা দীপকের সঙ্গে থেকে গোয়েন্দাগিরির বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করে। গোয়েন্দার কাজ শুধু যেপুরুষের একচেটিয়া নয়, তা প্রমাণ করা তন্দ্রার ইচ্ছা। তাই দীপকের কাছে সে শিক্ষানবিশী গ্রহণ করছিল।

গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ তন্দ্রা চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল।

দীপক তা দেখে তন্দ্রার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—কি হলো তন্দ্রা?

তন্দ্রা আতঙ্কিতভাবে একদিকে নির্দেশ করে বলল—ওই দেখুন।

—ওদিকে দেখার মতো কি আছে? কথাটা বলেই দীপক সামনে চেয়ে দেখে একটা কালো রঙের গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে! গাড়িটা জাল দিয়ে চারিদিকে ঘেরা। গাড়িটার ভেতরে কতকগুলি লোক যেন বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে।

জীবজন্তু যেমন খোঁয়াড়ের মধ্যে করে চালান দেয় তেমনি করে যেন লোকগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

দীপক বুঝতে পারল, গাড়িটা নিশ্চয়ই পুলিস ভ্যান নয়। তবে একটা গাড়িতে এভাবে লোক চালান দেবার উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই যে সাধু হতে পারে না তা দীপক বুঝতে পারল।

দীপক বেশ একটু দূরত্ব রেখে গাড়িখানাকে অনুসরণ করে চলল।

হঠাৎ—

একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে দেওয়া হলো। সাত আটটি মেয়েকে গাড়ি থেকে নামান হলো। তাদের সঙ্গে নামল তিনজন প্রহরী। প্রত্যেক প্রহরীর হাতেই চাবুক। মেয়েরা একটু অবাধ্য হলেই তাদের পিঠে চাবুক পড়ছে সশব্দে।

এরকম শোচনীয় দৃশ্য দেখে আত্মসংবরণ করা দীপকের পক্ষে কঠিন। তবু সে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করল। মেয়েগুলিকে যে এই বাড়িটাতে আটক রাখা হবে তা বুঝতে দীপকের দেরি হলো না।

দীপক ফিসফিস করে তন্দ্রাকে বলল—তন্দ্রা, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। ব্যাপারটা শিগ্‌গীরই হাওড়া পুলিস হেড্‌কোয়ার্টার্সে জানাও। আমার নাম করে বলো, যত সত্বর সম্ভব পুলিস ফোর্স যেন এখানে চলে আসে।

তন্দ্রা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। একটু পরেই দীপক হঠাৎ কালান্তকের মতো পিস্তল হাতে প্রহরীদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—বাছাধনেরা, নড়বার চেষ্টা করলেই তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনো! অনেক খেলা দেখলাম, এখন শান্ত হয়ে মাথার ওপর হাত তোল।

দুজন প্রহরী হাত তুলল। তৃতীয়জন কোমর থেকে ছোরাটা বের করবার চেষ্টা করতেই দীপক তার হাত লক্ষ্য করে ফায়ার করল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন প্রহরীই হাত তুলল।

দীপক মেয়েদের দিকে চেয়ে বলল—আপনাদের একজন ওদের কাছ থেকে পিস্তল বা ছোরাগুলো নিয়ে আমাকে দিন। এক্ষুনি। দেরি করবেন না একটুও।

মেয়েদের মধ্যে একজন বলল—দোহাই আপনার, চলে যান এখান থেকে।

দস্যুসর্দার হোয়াংলীর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নেই…

—হোয়াংলী! দীপক চমকে ওঠে।

—হাঁ, হোয়াংলী। দীপকের পেছন থেকে কে যেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—মাথার ওপর হাত তোল বন্ধু। এক্ষুনি। না হলে…

দীপকের পিঠে পিস্তলের স্পর্শ। দীপক বুঝতে পারে হোয়াংলী স্বয়ং তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করা বৃথা।

দীপক পিস্তল ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়ায়।

কোনও প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত অবকাশ পাবার আগে দীপক শত্রু হাতে বন্দী হয়।

• • •

তন্দ্রা হাওড়া পুলিস হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করতেই স্থানীয় পুলিস চীফ মিঃ সেন চার পাঁচজন আর্মড্ পুলিস নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে ছুটে চলেন।

—যতো জোরে পার গাড়ি চালাও! মিঃ সেন ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আদেশের ভঙ্গিতে বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি বেড়ে যায়। ত্রিশ… চল্লিশ…পঞ্চাশ…ষাট… স্পীডোমিটারের কাঁটা কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ ড্রাইভার গাড়িতে ব্রেক কসে।

—কি হলো? মিঃ সেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

—সামনে দুটো গাড়ি এমনভাবে রাখা যে আমাদের গাড়ি চালান আর নিরাপদ নয়।

—সরে যেতে বলো। হর্ন দাও।

ড্রাইভার চার পাঁচবার হর্ন দেয় কিন্তু সামনের গাড়ি দুটির পথ ছেড়ে নড়বার কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

মিঃ সেন বলেন—আর এক মুহূর্ত দেরি করা আমাদের উচিত হবে না। তোমরা পিস্তল বের করে গাড়ির লোকদের গ্রেপ্তার কর।

সকলে পিস্তল হাতে এগিয়ে যায়।

কিন্তু গাড়ি দুটির কাছাকাছি পৌঁছেই তারা অবাক হয়ে যায়। গাড়ির ভেতরে কেউ নেই। শূন্য গাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

অকস্মাৎ ভেসে আসে প্রচণ্ড অট্টহাসির শব্দ—হাঃ হাঃ হাঃ! মিঃ সেন মুখ তুলে তাকান সবিস্ময়ে।

চোদ্দ

—পরাজয়ের গ্লানি—

অট্টহাসি থেমে যায়।

মিঃ সেন আর তাঁর দলের লোকেরা দেখেন পাশের ঝোপগুলির মধ্য থেকে বন্যার প্রবাহের মতো সশস্ত্র লোকেরা বেরিয়ে আসছে। সংখ্যায় তারা আট দশজনের কম নয়।

—সাবেওার! মিঃ সেন হাঁক দেন।

কিন্তু অস্ত্রগুলি তাঁদের দিকে উদ্যত করে রেখে লোকগুলি বলে—তুমিই সাবেণ্ডার কর মিঃ সেন! তা না হলে তোমাদের মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। তোমাদের দলের গোদা দীপক চ্যাটার্জীকে আগেই ধরেছি। এখন তোমাদেরও যমের বাড়িতে পাঠাব।

—কে তোমরা ?

—আমরা হোয়াংলীর অনুচর। কিন্তু আর কথা নয়। হাতের অস্ত্রগুলি ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। অন্যথায় মৃত্যু নিশ্চিত।

মিঃ সেন আর দলের চার-পাঁচজন লোকই বাধ্য হয়ে অস্ত্রত্যাগ করে। মিঃ সেন দাঁতে দাঁত চেপে বলেন—সামান্য একটু ভুলের জন্যে আমাদের হোয়াংলীর ফাঁদে পা দিতে হলো !

দস্যুদলের লোকেরা অস্ত্রগুলি আত্মসাৎ করে। তারপর মিঃ সেনের দলের লোকদের গাড়িগুলিতে তুলে তাদের দিকে পিস্তল উঁচু করে ধরে। একজন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চালাতে শুরু করে।

* * *

যে বাড়িতে দীপককে আটকে রাখা হয়েছিল সেখানেই মিঃ সেন আর দলের লোকদেরও নিয়ে দস্যুদলের লোকজন প্রবেশ করে।

হোয়াংলী তাদের দেখে আনন্দে অট্টহাসি করে ওঠে। তারপর একটা বড় ঘরের মধ্যে তাদের আটক করতে বলে।

ঠিক যেভাবে জন্তু-জানোয়ারকে আটক করে রাখে সেইভাবে ওদের সব পাশাপাশি হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো।

হোয়াংলী বজ্রকঠিন স্বরে বলল—এবার তোমাদের সবাইকে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। তোমাদের সবাইকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে হোয়াংলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হলে তাদের কি ধরনের শাস্তি পেতে হয়।

কেউ কোনও কথা বলে না।

হোয়াংলী তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে—লছমন, রঘুয়া, জগু, তোমরা এদের সবগুলোকে তিল তিল করে কষ্ট দিয়ে হত্যা করবে। যেন ওরা বুঝতে পারে আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার শাস্তি কি ! হাতের পায়ের এক-একটি আঙুল

কেটে কষ্ট দিয়ে দিয়ে এদের শিক্ষা দেবে। তারপর গলা ছুরি দিয়ে কেটে হত্যা করবে!

বন্দীদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছায়া।

•   •   •

এদিকে তন্দ্রাও নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। তন্দ্রা হাওড়া পুলিস হেড্‌কোয়ার্টার্সে কোন করেই গাড়ি নিয়ে ছুটে আসে দীপকের কি হলো তা দেখবার জন্যে।

কিন্তু দীপকের কোনও চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। তন্দ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে হঠাৎ তার চমক ভাঙল। সে দেখল মিঃ সেন আর তাঁর দলের চারজন আর্মড্ পুলিসকে নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দী করে গুণ্ডারা ওই বাড়িতে ঢুকল।

এখন ঘটনাটা কি ঘটেছে তা বুঝতে তন্দ্রার বেগ পেতে হলো না। এখন কি করা যেতে পারে?

হঠাৎ একটা চিন্তা তন্দ্রার মাথায় খেলে গেল। সে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পূর্ণগতিতে গাড়ি চালিয়ে দিল। একটু পরে একটা পেট্রল পাম্পের টেলিফোনে গিয়ে পয়সা দিয়ে সে ফোন করল লালবাজারের কণ্ট্রোল রুমে। তারপর বিজলীবাবুকে এবং রতনলালকে। তার টেলিফোনের ফলে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো।

পনেরো

—অন্যদিকে—

এদিকে লালবাজার কণ্ট্রোল রুমেও ঘন ঘন টেলিফোন ধ্বনিত হতে থাকে। টেলিফোনের রিসিভার তোলেন ইন্‌স্পেক্টার মিঃ ড্যানিয়েল।

—হ্যালো, কে ?

—আপনি আমাকে চিনবেন না। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর ভেসে আসে—তবে আমাকে চিনতেন গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। তিনিও এখন শত্রুর হাতে বন্দী। তবে আমার নাম হয়ত শুনে থাকতে পারেন।

—কি আপনার নাম ?

—আমাকে সকলে গ্রীন ড্রাগন বলে জানে।

—ও আপনিই সেই দস্যু গ্রীন ড্রাগন যার নাম বড় বড় হরফে আমাদের কালোখাতায় লেখা আছে !

—ঠিক ধরেছেন, তবে আমায় প্রত্যক্ষভাবে আজ পর্যন্ত কেউ চেনে না—কোনও কাউকে সে সুযোগও দিইনি আমি !

—আচ্ছা, সে কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমাদের কেন টেলিফোন করছেন ?

হো হো করে হেসে ওঠে গ্রীন ড্রাগন। প্রাণখোলা অট্টহাসি। তারপর বলে—এই আর্জেন্ট ফোনটা করা হচ্ছে আমার কোনও প্রয়োজনে নয়—কারণ পুলিস বিভাগকে আমার কোনও সময়েই প্রয়োজন নেই। এটা আপনাদের সাহায্যের জন্যেই করছি।

—আমাদের সাহায্য ?

—হ্যাঁ, পুলিস অফিসার মিঃ সেন, তাঁর দলবল এবং খ্যাতনামা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আজ দস্যু হোয়াংলীর হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুর জন্যে প্রহর গুনছেন। আপনার বোধ হয় জানা আছে এই কুখ্যাত দস্যুটার প্রতি আমার কি পরিমাণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ ! তাই আমি চাই অবিলম্বে আপনারা তাকে ধরে কোর্টে চালান দেন এবং দীপকবাবু ও মিঃ সেন প্রভৃতি সকলকে মুক্ত করেন।

—কিছুক্ষণ আগেই আমরা দীপকবাবুর সহকর্মিণী তন্দ্রা দেবীর কাছ থেকে

অনুরূপ খবর পেয়েছি। তাই আমরা এক্ষুনি রওনা হচ্ছি সেখানে। আধঘণ্টার বেশি দেরি হবে না সেখানে পৌঁছুতে।

—তা ঠিক, কিন্তু আধঘণ্টা পরে এলে দেখতে পাবেন সব শেষ। ওদের হত্যা করে হোয়াংলী গা-ঢাকা দিয়েছে।

—কিন্তু তার আগে কি করে যাওয়া সম্ভব ?

—তার আগে আসতে পারবেন না তা আমিও জানি। যাক্, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন। আমার কর্তব্য আমি সম্পাদন করলাম। আমার হাতে কথা বলবার মতো সময় আর নেই। কাজেই…

খট্ করে শব্দ হয়। বোঝা যায় কানেকশন ও পক্ষ থেকে কেটে দেওয়া হলো।

মিঃ স্যানিয়েল আর কোনও কথা বলেন না। তিনি রেডি হবার জন্যে তাঁর লোকদের তাড়া দিতে ছোটেন।

• • •

কয়েক মিনিট পর।

দীপক চ্যাটার্জীর সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল ছুটে আসে লালবাজারে।

রতনলালকে দেখে মিঃ স্যানিয়েল বলেন—এখন কি করা যায় রতনবাবু ? এইমাত্র গ্রীন ড্রাগন নামক দস্যুর কাছ থেকে ফোন পেলাম যে দীপকবাবু এবং মিঃ সেনের জীবন বিপন্ন। আমরা পৌঁছবার আগেই তারা ওঁদের মেরে ফেলতে পারবে।

তা হতে পারে না। রতনলাল বলে—লেট্ আস্ গো উইথ ফুল স্পীড—তারপর দেখা যাবে কি হবে। যদি দীপকের কোনও ক্ষতি হয় আমি হোয়াংলীকে যেমন করে হোক ধরে তার মাংস ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

—ডোণ্ট বি এক্সাইটেড্, রতনবাবু !

—না না, আমি মোটেই উত্তেজিত হইনি।

সঙ্গে সঙ্গে দুই লরী পুলিস ফোর্স ও একটা ওয়্যারলেস ভ্যান পূর্ণগতিতে ছুটে চলে লালবাজার থেকে উত্তরদিকে।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে পূর্ণগতিতে ছুটে চলে গাড়ি। অবশেষে ডানলপ ব্রিজের কাছে পেট্রল পাম্পে গাড়ি থামে। সেখানে দাঁড়িয়ে তন্দ্রা তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

তাদের দেখেই তন্দ্রা বলে—আসুন আর দেরি নয়। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে মাত্র দু'তিন মিনিট! গাড়ি আবার ছুটে চলে।

ষোলো

বন্দীদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল অজস্র অসহায়তা।

একজন দুর্বৃত্ত একটা বড় ধারাল ভোজালি বার করে এগিয়ে যায় মিঃ সেনের দিকে। মিঃ সেন আতঙ্কে চোখ বোজেন।

এমন সময়—

হঠাৎ শোনা গেল পিস্তলের শব্দ।

সাত-আটজন রাইফেল ও পিস্তলধারী লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

—কে তোমরা? হোয়াংলী চীৎকার করে ওঠে।

আগন্তুকদের প্রত্যেকের মুখেই সবুজ রঙের মুখোশ। তাদের দলপতি বলে ওঠে—আমরা হচ্ছি গ্রীন ড্রাগন। আত্মসমর্পণ কর হোয়াংলী, তা না হলে তোমাদের কারও নিস্তার নেই আমার হাত থেকে!

হোয়াংলী আর দলের সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে। সকলের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে।

তাদের বন্দী করে প্রত্যেকের হাত পা বেঁধে চলে যায় গ্রীন ড্রাগন আর তার দলবল।

মুহূর্তমধ্যে ঘরের মধ্যে যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায়। দীপক, মিঃ সেন আর অন্য পুলিশের লোকদের মুখ থেকেও কোন কথা বের হয় না।

• • •

মিনিট পনেরো পর। বিজলীবাবু ও তাঁর দলবল, লালবাজারের চার লরী বোম্বাই পুলিস ফোর্স, রতনলাল, তন্দ্রা একে একে এসে হাজির হয় বাড়ির সামনে।

পুলিসের লোকদের মুক্ত করে হোয়াংলী আর তার দলবলকে গ্রেপ্তার করেন বিজলীবাবু।

—কে এদের এ দশা করল? বিজলীবাবু প্রশ্ন করেন।

—গ্রীন ড্রাগন। দীপক উত্তর দেয়।

ঘরের কোণে গ্রীন ড্রাগন যে কাগজটা ফেলে রেখে গিয়েছিল, দীপক তা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

তাতে লেখা:

প্রিয় বিজলীবাবু,

আপনারা এসে এদের গ্রেপ্তার করবেন আর আপনাদের লোকদের উদ্ধার করবেন জানি। কিন্তু আশা করি কোনওদিন আমার কথা ভুলতে পারবেন না আপনারা। আপনারা সকলেই জানেন দীর্ঘদিন ধরে দস্যু হোয়াংলীকে আমি কি রকম ঘৃণা করতাম। কিন্তু তখনও তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কাজ করবার এত বড় সুযোগ পাইনি। আজ সে সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করলাম। আপনাদের কাজ তাই আজ বাধ্য হয়ে আমাদেরই করে যেতে হলো। ইতি—

গ্রীন ড্রাগন

—আশ্চর্য! বিজলীবাবু শুধু একটা কথা বলেন।

আর সকলে নিরুত্তর।

—শেষ—